১৫-০৯-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - রুহানী বাবা স্বয়ং এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের সূচনা করেছেন। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই এই যজ্ঞের রক্ষক, তাই তো তোমরা এত প্রশংশার যোগ্য, কিন্তু তা বলে তোমরা, অন্যদেরকে দিয়ে নিজের পূজা করাতে পারো না।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমারা যখন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির উৎকর্ষতার চরম সীমায় পৌঁছবে, তখন কেমন স্থিতি হবে তোমাদের ?

উত্তর :- সেই সময় তোমার স্থিতি হবে, সম্পূর্ণ রূপে অচল-অটল। কোনও প্রকারের মায়ার ঝড়, তোমাকে নাড়াতেও পারবে না। অর্থাৎ তুমি কর্মাতীত অবস্থার দিকে পৌঁছোতে থাকবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছতে না পারার কারণে, মায়ার ঝড়, স্বপ্ন ইত্যাদি আসতে থাকে। বর্তমানের এই জগৎটা হলো যুদ্ধের ময়দান। মনেও নতুন নতুন আশা প্রকট হতে থাকে। কিন্তু, এসবে ভয় পেলে চলবে না তোমার। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

গীত :- তোমাকে পেয়েই সবকিছুই পাওয়া হয়ে গেছে যে আমার। ধরিত্রি থেকে আকাশ সবই তো আমার।

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, এই গীত তো তোমরা অনেক বার শুনেছো। এর মর্মার্থ অনুধাবন করে, সেই স্থিতিতেই থাকতে হবে তোমাদের। নিজেদের লক্ষ্য তো তোমরা স্থির করেই ফেলেছো। বেহদের বাবার থেকে এখন তোমরা বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে চলেছো, যে বাবাকে অর্দ্ধ-কল্প ধরে ডেকে আসছো। আর রাবণ, তোমাদের থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্সাও কেড়ে নেয়। জগতের লোকেরা তো এসবের কিছুই বোঝে না। তোমরা কিন্তু তা যথার্থই বোঝো। এখানকার এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। যা কোনও মানুষের সৃষ্ট নয়। এমন কি প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবাও কিন্তু তা রচনা করেননি। যেহেতু এটা রুদ্র যজ্ঞ। যা জ্ঞানসাগর অর্থাৎ শিববাবা স্বয়ং এই যজ্ঞের সূচনা করেছেন। জগতে তো অনেক প্রকারের যজ্ঞেরই প্রচলন আছে। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, দক্ষ প্রজাপতি সেগুলি রচনা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে তো কোনও দক্ষ প্রজাপতি নেই। আসলে ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা (প্রজাদের পিতা)। কিন্তু, এই দক্ষ প্রজাপতি শব্দটি এলো কোথা থেকে ? বাবা বসে সে সবই বোঝাচ্ছেন যে, এসব ভুল তথ্যগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শাস্ত্রগুলিতে অনেক লম্বা-চওড়া গল্প-গাঁথা লেখা হয়েছে। বাবা তাই বলছেন, এতদিন যা কিছু শুনে এসেছো, সেসব কিছুই এখন ভুলে যাও। আমি যা কিছু শোনাচ্ছি, কেবলমাত্র তাই শুনতে থাকো। প্রজাপিতা তো কেবল একজনই হবে - তাই না ! জগতের লোকেরা যে কোনও যজ্ঞেরই রচনা করুক না কেন, তার সবগুলিই হদের জাগতিক বস্তু-কেন্দ্রিক- জাগতিক যজ্ঞ। কিন্তু, এই যজ্ঞ হলো বেহদের রুহানী বাবার রুহানী যজ্ঞ। এই যজ্ঞে দরকার প্রকৃত ব্রাহ্মণদের। জগতের ব্রাহ্মণেরা তো (শারীরিক কর্ম-বৃত্তির দ্বারা জন্ম-সূত্রে) কুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ। (মাতৃগর্ভে জন্ম)। কিন্তু, তোমরা বি.কে.-রা তো মুখ-বংশাবলী (দত্তক) ব্রাহ্মণ। মুখ-বংশাবলীরা কখনও পুজারী বা পুরোহিত হয় না। তারা কেবল পূজ্যই হয়। কিন্তু জগতের ব্রাহ্মণেরা পুজারী। তাই কেবল তোমরাই ভজন-কীর্তনের উপযুক্ত। যদিও তোমাদের পূজা-অর্চনা এখনই শুরু হয় না। যেহেতু কোনও দেহধারীর পুজা-অর্চনা করা উচিত নয়।

কেবলমাত্র সত্যযুগের দেবতারাই সম্পূর্ণ পবিত্র। হিন্দুদের রীতি-নীতিই এমন যে, যেমন স্ত্রীকে বলা হয় তোমার পতি-ই তোমার পরম গুরু, তোমার ঈশ্বর, তোমার সবকিছুই তোমার পতি। সুতরাং পুণ্যের খাতিরে স্ত্রীরা পতির চরণ-ধোঁয়া জল পান করে। যদিও আজকাল এইসব রীতি-নীতির আর চলন নেই। যদিও এখনকার সিভিল কোর্টের বিয়েতে সেইসব কথার আর উল্লেখ করা থাকে না- তোমার পতি-ই তোমার গুরু, ঈশ্বর, সবকিছু, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরণের শব্দগুলি সবই প্রবঞ্চণা মূলক। সেইসব ধারণাগুলিকে পাকাপোক্ত করার জন্য তেমন সব চিত্রাদিও তৈরী করা হয়েছিলো। যেমন- লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রে দেখানো হতো, লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছে। ফলে লোকেরাও ভাবতো, লক্ষ্মীও যখন এমন ভাবে পতি-সেবা করেন, হিন্দুর স্ত্রী হিসাবে তাদেরও অবশ্যই তা করা উচিত। কিন্তু, যে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাকে দিয়ে কি এমন কার্য করানো যেতে পারে ? অবশ্য অনেক ধরণেরই লোকই তো থাকে। যে যেমন সুবিধা চায় সে তেমন প্রথার চিত্রাদি বানায়। কিন্তু, স্বর্গ-রাজ্যে এমনটা মোটেই সম্ভবই নয় যে, লক্ষ্মী বসে বসে নারায়ণের পা-টিপে দেবে। (মজার ছলে) ব্রহ্মাবাবা তখন বলেন, আমিও গিয়ে দ্রোপদীর পদ-সেবা করবো। আর তখনই উনি ওনার কৃষ্ণ-রূপ দর্শন করান। আসলে এগুলি সবই অকাজের কথা। যেমন ত্রেতার রাম কিন্তু আদৌ চার-ভাই ছিলেন না। সেই যুগে বাচ্চা তো কেবল একটি-একটি করেই হতো। তবে সেখানে চারটি সন্তান হবেই বা কি প্রকারে ! তাই তো বাবা বলছেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের সব শাস্ত্রের সার কথাগুলিই শোনাচ্ছি। এইসব তথ্য কেবল তোমাদেরকেই বোঝানো যেতে পারে। তোমরা তা আবার অন্যদেরকেও বোঝাতে পারো।

বাবা আরও জানাচ্ছেন, লোকেদের যে শপথ-বাক্য পাঠ করানো হয়, তার সবটাই মিথ্যা। যেখানে তারা বলে থাকে যে, গীতার বাণী শুনিয়েছিলেন কৃষ্ণ। আবার সেই গীতাতেই হাত স্পর্শ করিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে সাক্ষী করে বলায় যে, "আমি যাহা বলিব, সত্য বলিব।" সেক্ষেত্রে কিন্তু বলায় না যে, কৃষ্ণের উপস্থিতিকে সাক্ষী করে ...। সেই সময় কিন্তু ঈশ্বরের নামই বলা হয়। তখন কিন্তু বলে না যে, কৃষ্ণ ভগবান সর্বত্রই বিরাজ করছে। যা ভগবানের ক্ষেত্রে বলে থাকে তারা। অতএব বুদ্ধি থেকে একথা একেবারেই ঝেড়ে ফেলে দাও যে, গীতার ভগবান কৃষ্ণ। আর মিথ্যে শপথ নেওয়াবার কারণে, সেই শপথের কোনও শক্তিই আর থাকে না। একমাত্র ধর্মরাজ-ই একেবারেই সঠিক। যিনি সত্য, সুপ্রীম জজ বা চরম বিচারক। সত্যযুগে এসব বিচারক, উকিল, আদালত ইত্যাদি কিছুই থাকেই না। যেহেতু সেখানে এমন কোনও ঘটনাই ঘটে না। আত্মারা তাদের কর্ম-ফলের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে তবেই ওখানে যেতে পারে। আবার নতুন ভাবে সতোপ্রধান-সতো-রজো-তমো এইসব স্থিতিতে আসতে হয়। এখন তোমরা যাকিছুই দেখছো, তার প্রত্যেকটি বস্তুই আবার নতুন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পুরাতন অবস্থায় আসবে। দুনিয়াও তেমনি নতুন থেকে পুরোনো হবে। বর্তমানের এই দুনিয়াটা অতি পুরোনো হয়েছে। কিন্তু তা কতটা পুরোনো হয়েছে, তা কিন্তু সঠিক কেউ জানে না। প্রত্যেকটি বস্তুকেই সর্বদা সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়। যুগকেও চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমটি নতুন আর চতুর্থটি পুরোনো। পৃথিবীও প্রথমে নতুন অবস্থায় থাকে, তারপর তা এক-চতুর্থাংশ পুরোনো, মধ্যবর্তীতে অর্দ্ধ-পুরোনো,..... অবশেষে সম্পূর্ণ পুরোনো। একসময়ে যা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার মতন অবস্থা হয়। প্রতি কল্পের মতন এই কল্পেরও আয়ু মোট ৫-হাজার বছর। যার অন্তিম সময়ে তোমরা এসে পৌঁছছো এখন। তাই তোমার এই অন্তিম জন্মে তুমি বাবার থেকে ২১-জন্মের জন্য আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হতে পারো। সত্যযুগ ও ত্রেতা

মিলিয়ে এই ২১-জন্ম। আর দ্বাপর ও কলিযুগ এই দুই মিলিয়ে ৬৩-জন্ম হয়। (মোট ৮৪-জন্ম) তবে কেনই বা তুমি কেবল মাত্র ৬৩-জন্ম বা তারও কম জন্ম নেবে, যা পাবে দ্বাপর আর কলিযুগে। শেষের অর্দ্ধ-কল্পে জন্মের আয়ুর সময় কম হয়ে এই ৬৩-জন্ম পায়, পতিত হওয়ার কারণে। কিন্তু শুরুর অর্দ্ধ-কল্পে (পবিত্র থাকার কারণে) জন্মের আয়ু অনেক বেশী থাকে। এখানে তোমরা এখন যোগ শিখছো। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা কেবল যোগ বা স্মরণের যাত্রা শিখতেই এখানে আসো না। তোমরা আসো বাবার সামনে বসে মুরলী শুনতে। যেহেতু এই মুরলী তোমাদের কাছে অতি প্রিয়। যোগ তো তোমরা যেখানে খুশী সেখানে বসেই তা করতে পারো। জাগতিক ছাত্রদের স্কুলের পরীক্ষা যখন খুব সামনে চলে আসে, তখন সে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার মাথায় কেবল পরীক্ষার কথাই ঘুরতে থাকে। এখানে তো তোমাদের পড়ার সাথে সাথে যোগও একসাথেই চলে। একই সাথে শিক্ষাদাতা শিক্ষককেও স্মরণ করা হয়ে যায়। তাই তো বাবা বার বার বলেন, "মামেকম্ য়াঁদ করো"- অর্থাৎ কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। কিন্তু শাস্ত্রের শাস্ত্রকারেরা ভুল বশতঃ আমার নামের বদলে কৃষ্ণের নাম লিপিবদ্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু কৈ, সাধু-সন্ন্যাসীরা তো কৃষ্ণকে স্মরণ করে না ! তবে কে তা বলেন, 'মনমনাভবঃ' ? তত্ব বা ব্রহ্মতত্ব তো এমন কিছু বলতেই পারে না। (শিব) বাবা এনার (ব্রহ্মার) মুখকেই আধার বানিয়েই বলেন, "বাচ্চারা, কেবল মাত্র আমাকেই স্মরণ করো।" আর কৃষ্ণ তা বলবেই বা কি ভাবে! আর কৃষ্ণের আত্মা কারও শরীরে প্রবেশ করে যে তা বলবে-তাও তো সম্ভব নয়। এইসব পয়েন্টগুলি বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে, তারপর তা অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে।

কংগ্রেস পার্টীর লোকেরা কত জোরে জোরে চিৎকার করে, তাদেরই নেতা বাপুজী (গান্ধীজী) কত ধীর-স্থির। উনি তো এই হদের সমাজের জাগতিক পিতা। আর এই বাবা হচ্ছেন - বেহদের রুহানী পিতা। গন্ধীজী তো আর সবারই পিতা হতে পারেন না। একমাত্র শিববাবাই জগৎ-সংসারের সবার পিতা। যদিও ব্রহ্মাও অবশ্য বাবা-ই। বর্তমানে যা কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো। সমগ্র দুনিয়া তো আর তা মানবে না, যেহেতু অন্যেরা তা জানতেই পারেনি এখনও। এখানে আমরা বি.কে.-রা নিরাকার শিববাবাকেই বাপু বা বাবা বলে সম্বোধন করি। যিনি জগতের সব বাবাদেরও বাবা। কত সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট বাবাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন উনি। কখনও আত্মার উপরে, কখনও পরমাত্মার উপরে, আবার কখনও বা শাস্ত্রের উপরে। ভারতে তো অসংখ্য-অজস্র শাস্ত্র রয়েছে, কিন্তু অন্য ধর্মে তাদের নিজের ধর্মের কেবল একটি করেই ধর্ম-শাস্ত্র থাকে। কিন্তু ভারতে তো কত অনেক ধর্ম-শাস্ত্র। ধর্মগুরুর-রা যা কিছুই বলে, অনুগামীরা তা শুনে তাতেই সত্য সত্য বলতে থাকে। যদিও তাতে তাদের কোনও সঠিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না। যেমন উদাহরণ স্বরূপ রাধা-স্বামী পন্থীদের ধরা যেতে পারে - তারা সেই পন্থার নাম রেখেছে "রাধা-স্বামী"। রাধার স্বামী তো কৃষ্ণ। বাস্তবে, ভারতবাসীরা যে রূপে কৃষ্ণকে ভাবে, প্রকৃত অর্থে কিন্তু তা নয়। রাধা তো কুমারী - আর কৃষ্ণ কুমার। তবে কৃষ্ণকে প্রভু বা স্বামী বলা যাবে কি প্রকারে ! যখন তাদের স্বয়ম্বর (বিবাহ) হয়ে যায়, আর তারপরে লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে নতুন পরিচয় গ্রহন করে, একমাত্র তখনই কৃষ্ণকে স্বামী বলা চলে। ছোটবেলায় তো তারা নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা করতো, তাই তখন কেউ কোনও প্রকৃত স্বামী হতে পারে না। যেহেতু এমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সাগাই (পাটী-পত্র/পাকা কথা) হওয়ার পরেও, বিশেষ কোনও কারণে তা ভেঙ্গেও যায়। এরপর তাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে দেখানো হয়। কিন্তু তারা তো এটাও জানে না যে, নারায়ণের পিতার নাম কি ? কোনও মতেই তারা তা বলতে পারবে না। এদিকে আবার তারা কৃষ্ণের পিতা-মাতাকেও দেখিয়ে

থাকে। রাধা আর কৃষ্ণের দু-জনের মাতা-পিতা ভিন্ন-ভিন্ন। রাধা এক জায়গার আর কৃষ্ণ অন্য জায়গার। সত্যযুগের প্রতিটা ঘটনাকেই তারা পুরোপুরি-ই অর্থহীন করে ফেলেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মাতা-পিতার নামই বা কোথায় ? নারায়ণের জন্মস্থানই বা কোথায় ? তারা কেউ এটাও জানে না যে, রাধা-কৃষ্ণই পরবর্তীতে লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে পরিচিতি লাভ করে। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন, ভক্তি-মার্গকে কত সব অলংকারে সাজিয়েছেন তারা। জ্ঞান-মার্গে তো কেবল বীজ-কে জানলেই হয়। বীজের জ্ঞান থাকলেই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞানই বুদ্ধিতে চলে আসে। তোমরা জেনেছো ভগবান যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্বোচ্চ, পরমধামে থাকেন যিনি পরমাত্মা, সেখানেই তোমরা সব আত্মারাও থাকো। আর সূক্ষ্ম-বতনে থাকেন কেবল ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। এদের মধ্যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুরই কেবল পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু শংকরের বেলায় তা ঘটে না। যেমন শিববাবা সূক্ষ্ম তেমনি শংকরেরও রূপ সূক্ষ্ম। অথচ লোকেরা শিব আর শংকরকে এক করে দেখায়। আসলে ওনারা দু-জন পৃথক পৃথক সত্ত্বার। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালনা, আর শংকরের দ্বারা বিনাশ কার্য করান। এই ব্রহ্মাই পরবর্তীতে বিষ্ণু-রূপে প্রকাশ পান। ব্রহ্মা-সরস্বতী-ই আবার লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হন। ততত্বম্ - এটা তোমার উপরেও প্রযোজ্য, যেহেতু তুমিও সেই বংশেরই বংশধর। তাই তো স্বয়ং শিববাবা তোমাকে এইসব রহস্যের কথা শোনাচ্ছেন। কিন্তু সেই ধারণাকে তোমরা ধারণ করতে পারো নিজেদের গুণগত বুদ্ধির ক্রমানুসারে। গত কল্পে যে যেমন পদ পেয়েছিলো, বর্তমানে তারা সেই অনুসারেই পুরুষার্থ চালিয়ে যাচ্ছে। পুরুষার্থ বিনা কোনও প্রালব্ধের পুরুস্কার পাওয়া যায় না। পুরুষার্থের ধরণ দেখেই বোঝা যায়, কল্প পূর্বেও তুমি এমনই পুরুষার্থ করেছিলে।

তোমাদের পঠন-পাঠন তো এখনও চলছে। রুদ্রমালা (শিবের) আর বিষ্ণুর মালা (বৈজয়ন্তীমালা)-র বিষয়ে তো প্রশস্তিই আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের কোনও মালা হয় না, যেহেতু তোমরা তখন পুরুষার্থী থাকো বলে। কারণ, আজ হয়ত তোমরা খুব ভাল পুরুষার্থ করলে, কিন্তু পরদিনই হয়ত মায়ার বক্সিং-এ কাবু হয়ে পড়লে। রুদ্রমালা তৈরী হয়ে যাবে তখন তোমাদেরও ট্রান্সফার হয়ে যাবে। তাই কেবল ব্রাহ্মণেরা পুরুষার্থী হয়। আজ হয়ত খুব ভালভাবে চলছো, কালকেই আবার তার পতনও হতে পারে। তাই ব্রাহ্মণদের মালা বানানো যায় না। পূর্বে বাবা মালাও বানাতেন, কিন্তু তা যারা তৃতীয়-চতুর্থ নম্বরে আসার মতন থাকতেন একমাত্র তাদেরই, যা আজকাল আর করা হয় না। এখন এটা একটা যুদ্ধের ময়দান। যদি কোনও কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তো, সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে জেনে নাও - যেহেতু অন্যকে তো বোঝাতে হবে যে তোমাদেরকেই। যারা জ্ঞানে কাঁচা, তারাই ঘাবড়ে যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ধারণা হয় ক্রমিক নম্বর অনুসারে। অনেকে বলে যে, বাবা আপনি তো বলেছেন যে, মায়ার নানা প্রকারের তুফান আসবে, কিন্তু আমরা কি প্রকারে তার উপর বিজয় পাবো ? অনুভবী টিচার না হলে তা বোঝাবেই বা কিভাবে ? বাবা বোঝাচ্ছেন, মায়ার তুফান, স্বপ্ন, ইত্যাদি সব আসতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় (উৎকর্ষতার চরম শিখরে) পৌঁছতে পারছো। যতক্ষণে কর্মাতীত অবস্থায় আসতে না পারছো, সেই সময় পর্যন্ত এমন ঝড়-ঝাঁপটা অনেক কিছুই আসতে থাকবে। বুড়োকেও যুবক বানিয়ে দেবে, মনে নতুন নতুন আশা প্রকট হবে। তুমি নিজের মনেই ভাববে - পূর্বে কখনও এমন তো ভাবিনি। বাবা বলছেন- আরে, এই তো সবে তোমরা যুদ্ধের ময়দানে এসেছো। বৈদ্য-ডাক্তারেরা যেমন বলে যে, এই ঔষধেই গোড়া থেকে রোগ নির্মূল হয়ে যাবে, বাবাও তেমনি অনুভবী (বৈদ্য)। সবকিছুরই উপায় জানিয়ে দেন তোমাদেরকে। অতএব সেসবে বিন্দুমাত্রও ভয় পেয়ো না। কেউ কেউ আবার বলে থাকে যে, "আমি তো বুঝে উঠতেই পারছি না, জ্ঞানে আসার পর থেকেই কি কি যে হয়ে চলেছে, এর থেকে তো

ভক্তি-মার্গই ভাল ছিল"। বাবাও তখন তাদের বলেন- আচ্ছা, তবে তুমি ভক্তি-মার্গেই যাও, সেখানে তোমার কাছে এইসব ঝড়-ঝাপটা আসবে না। বাবা কিন্তু সবকিছুই সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেন। যারা নিয়ম করে রোজই তা শোনে, তাদের বুদ্ধিতেই পুরোপুরি ধারণা আসবে। মুখ্য ব্যাপার হলো, চর্চা ও অভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করা। তারপর তুমি যেখানে খুশী সেখানে যাও। মুরলী তুমি পেতেই থাকবে। মিলিটারী বিভাগেও মুরলী পঠনে নিষেধ নেই। মিলিটারীরা কখনই বলবে না যে, বাইবেল বা গুরু-গ্রন্থ ইত্যাদি পাঠ করা চলবে না সেখানে। মিলিটারীতে তারা সবকিছুই পড়ে। তাদের নিজস্ব মন্দিরও থাকে। অতএব তুমি যেখানেই থাকবে, সেখানেই মুরলী পাবে। তবুও তোমার নিজের তো কোনও লক্ষ্য অবশ্যই থাকবে।

তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্যই হলো, সবাইকে বাবার পরিচয় জানানো। সর্বাগ্রে তোমার নিজের মধ্যে এই নিশ্চয়তা আনতে হবে যে, আমাকে যিনি পড়ান সেই শিক্ষক হলেন নলেজফুল গড় ফাদার অর্থাৎ জ্ঞান-সাগর ঈশ্বরীয় পিতা, তবেই এই পাঠের অন্যান্য কথাগুলিও বুঝতে পারবে। অন্যেরা কেউ তো বুঝতেই পারে না, কিভাবেই বা ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং এসে তা পড়ান। মুরলীতে যদিও তা লেখাই থাকে, ভগবান উবাচ, যা ঈশ্বর স্বয়ং বলছেন। ওনার নাম 'শিব'। একমাত্র উনিই পরম-আত্মা। পরম অর্থাৎ সুপ্রীম বা সর্বোচ্চ। সবারই প্রকৃত ঘর পরমধাম অর্থাৎ পরমধাম নিবাসী। আত্মাদের মধ্যেও কর্ম-কর্তব্যের সর্বোচ্চ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট তো কারও (শিববাবার) অবশ্যই থাকবে। তিনি হলেন শিব। উনি একাধারে রচনাকার, নির্দেশক ও প্রধান চরিত্রের অভিনয়কারী। যেমন তিনি রচয়িতা, করনকরাবনহারও তিনিই আবার। শুধু তাই নয়, উনি নিজে আবার পার্টধারী-ও। উনিই এনার(ব্রহ্মার) শরীরকে আধার করে কত লম্বা পার্ট করেন। যে কারণে এই ভারতভূমিতেই স্বর্গের সৃষ্টি হতে পারে। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ বাবা, যিনি শিববাবা, স্বয়ং এখানে আসেন। কিন্তু উনি এসে করেনটা কি - লোকেরা সেটাই জানে না। উপরন্তু তারা কল্পের আয়ুটাকেই অনেক লম্বা বলে প্রচার করেছে। বাবা জানাচ্ছেন, ওনার আসার সময়টাই হলো, কলিযুগের অন্তিম সময় এবং সত্যযুগের শুরু, এর মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ এই দুই যুগের সন্ধিক্ষনে বা সঙ্গম সময়ে।

পূর্ব কল্পেও সত্যযুগের শুরুতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তা ছিল অতি পবিত্র দুনিয়া। একমাত্র আমরা বি.কে.-রাই তেমন পবিত্র হতে পারি, আবার পরবর্তী সময়ে আমরাই পতিতে পরিণত হই। চড়তী-কলা অর্থাৎ উত্তোরণের সোপান, উতরতী-কলা অর্থাৎ পতনের রাস্তা কিভাবে তা ঘটে, বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এতদিনে অবশ্যই তা বুঝতে পেরেছো। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, লাগাতর সবাইকে বাবার পরিচয় জানাতে থাকো। যেখানে আমাদের এই বাবা স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, সেক্ষেত্র তো আমরা যারা ওনার বাচ্চা তাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী অবশ্যই হতে হবে। এই ভারতেই একদা সেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল, যা আজ আর নেই। তাই তো স্বয়ং ভগবানকে এখানে আসতে হয়। এই ভারতই যে শিববাবার জন্মস্থান। পূর্বেও উনি এসে ওনার বাচ্চাদের স্বর্গবাসের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। যা এখন তোমরা ভুলে গেছো। সবই স্মৃতি আর বিস্মৃতির এ এক আজব খেলা। এই জ্ঞানকে ভুলে গেলেই আবার তোমরা পতনের রাস্তায় হাঁটতে থাকবে। কিন্তু উন্নতির সোপানে জীবনমুক্তি পাওয়া যায় মুহূর্ত মাত্র সময়ের মধ্যেই। জীবন-বন্ধন অবস্থায় তোমাদের কত সময়ই তো চলে গেছে, যা পুঁথি-শাস্ত্রে তার কোনও উল্লেখই নেই। যেমন জনক রাজার কাহিনীর মতন। তাই বাবা জানাচ্ছেন, "ইতিপূর্বে তোমরা যা কিছু অধ্যয়ণ করেছো, সেসব কিছুই তোমরা এখন ভুলে যাও।

বাবা, শিক্ষক, সদগুরু সবই আমি। একমাত্র আমিই আগামী ২১-জন্মের জন্য তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকি। তা সত্বেও, অহো মম মায়া, তুমি এই জগৎ-কে কবর-খানা বানিয়ে দাও। যেখানে বাবা তা পরীর-রাজ্য বানায়। বাচ্চারা, এই মায়া তোমাদের কারও কারওকে বোকা বানায়, যেহেতু তারা সঠিক রীতিতে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারো না বলে।" ..... আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় সন্তানদের নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের ঈশ্বরীয় পিতা।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রতিদিন অবশ্যই মুরলী পড়তে হবে। মায়ার ঝড়-ঝাপটা এলে ভয় পাবে না মোটেও। যে কোনও প্রকারের ছলনা থেকে বাঁচার জন্য, শ্রীমৎকে আধার করো।

২) জ্ঞানের পাঠ আর যোগ- দুটোই একত্রিত। অতএব, শিক্ষক রূপী বাবাকে সর্বদাই স্মরণ করতে হবে। নিশ্চয় বুদ্ধিধারী হতে হবে আর অন্যদেরকেও তা বানাতে হবে। বাবার পরিচয় সবাইকে জানাতে হবে।

বরদান :- মন আর বুদ্ধির স্বচ্ছতা দ্বারা যথার্থ নির্ণয় শক্তিধারী সফলতা সম্পন্ন হও

বিস্তার :- যে কোনও কার্যে সফলতার প্রাপ্তি তখনই হয়, যখন উপযুক্ত সময়ে বুদ্ধি যথার্থ নির্ণয় নিতে পারে। কিন্তু নির্ণয় শক্তি তখনই সঠিক ভাবে কাজ করে, যখন মন আর বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকে। আর বুদ্ধিতে যাতে কোনও প্রকারের ময়লা না থাকে, সে নিমিত্তে যোগ-অগ্নি দ্বারা সেই ময়লাকে ভস্ম করে বুদ্ধিকে স্বচ্ছ বানাও। যে কোনও প্রকারের দুর্বলতাই ময়লা। সামান্য ব্যর্থ-সংকল্পও ময়লা। যখন এই ময়লা সম্পূর্ণ রূপে পরিস্কার হয়ে যাবে, তখন থেকে চিন্তামুক্ত আর স্বচ্ছ বুদ্ধির ফলে প্রতিটা কার্যেই সফলতা প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান :- সর্বদা শ্রেষ্ঠ আর শুদ্ধ সংকল্পের প্রকাশ থাকলে, ব্যর্থতা স্বাভাবিক ভাবেই ঢেকে যায়।